কাউকে পেছনে রাখা যাবে না

নাগরিক প্ল্যাটফর্ম

ব্রিফিং নোট ৩৯

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

'এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ' বৈশ্বিকভাবে গৃহীত জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা-২০৩০ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত দেশের নাগরিক সমাজের একটি উদ্যোগ। ২০১৬-এর জুনে নাগরিক সমাজের বিশিষ্টজনদের উদ্যোগে এ প্ল্যাটফর্ম আনুষ্ঠানিক-ভাবে যাত্রা করে। এ প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং এ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা। এজেন্ডা-২০৩০ বাস্তবায়নের ব্যাপকতা ও চ্যালেঞ্জের দিকগুলো বিবেচনা করলে বোঝা যায়, এর সফলতার ক্ষেত্রে বহু-অংশীজনভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক সক্রিয়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম গঠিত হয়েছে এবং এর কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নে সরকারের প্রচেষ্টাকে জোরদার করার লক্ষ্যে এবং উন্নয়নের সুফল যাতে পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে পৌঁছায়, সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১২০টির অধিক প্রতিষ্ঠান বর্তমানে এই প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কোভিড অতিমারির দূর্যোগপূর্ণ সময়কালে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম সক্রিয়ভাবে তার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সংলাপ সম্পর্কে

জাতীয় সংসদে ২০২২—২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট উত্থাপন করা হয়েছে এমন এক সময়ে যখন বাংলাদেশকে অতিমারি পরবর্তী অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে উত্তরণ ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অভিঘাত-এ দ্বিবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে । বিশ্বব্যাপী খাদ্য, সার ও জ্বালানি— এই তিনটি প্রধান পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি জনিত কারণে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অর্থনীতিতে উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনও অতিমারি পূর্ব পরিস্থিতে ফিরে যেতে পারেনি। এ ধরনের একটি পরিস্থিতিতে প্রান্তিক এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবিকা এবং ক্রয়ক্ষমতা রক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাদের ওপরই অতিমারির নেতিবাচক অভিঘাত তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি পড়েছে। এ ধরনের প্রেক্ষাপটে এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম ১৯ জুন ২০২২, রবিবার "জাতীয় বাজেট ২০২২—২৩: পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য কী আছে"শীর্ষক একটি মিডিয়া ব্রিফিংয়ের আয়োজন করে। ব্রিফিং-এ নাগরিক প্রতিনিধিরা বাজেটের বিভিন্ন দিক ও খাতভিত্তিক বরাদ্দ নিয়ে আলোচনা করেন।

জাতীয় বাজেট ২০২২–২৩: পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য কী আছে?

বাজেটে উপেক্ষিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, এবং নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি

প্রারম্ভিক বক্তব্যে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের সমন্বয়কারী আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ বলেন, বেশ কিছুদিন আগে এমন একটি আয়োজনের মাধ্যমে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম বাজেটে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রত্যাশা সরকার ও দেশবাসীর কাছে তুলে ধরেছিল। এরই মধ্যে অর্থমন্ত্রী ২০২২—২৩ অর্থবছরের বাজেট জাতীয় সংসদে পেশ করেছেন। প্রস্তাবিত বাজেটে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সেসব প্রত্যাশা কতটা পূরণ হয়েছে সেটি মিলিয়ে দেখা হচ্ছে এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য।

সভাপতির সূচনা বক্তব্যে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের কোর গ্রুপ সদস্য ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, এবারের বাজেট এমন একটি সময়ে ঘোষিত হয়েছে, যখন কোভিড-সম্পর্কিত অভিঘাত কাটিয়ে ওঠার আগেই ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের ফলে একটি অস্থিতিশীলতা পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সৃষ্টি হয়েছে যার অভিঘাত পড়েছে আমাদের অর্থনীতিতে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি। এমন একটি সময়ে প্রত্যাশা ছিল পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেটে বিশেষ উদ্যোগ ঘোষণা করা হবে। সেই বিবেচনায় ঘোষিত বাজেট কতটা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীবান্ধব হলো, বিভিন্ন দিক থেকে তার বিচার-বিশ্লেষণ করার জন্যই এই আলোচনার আয়োজন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনায় ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, গত ১৬ মে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের প্রাক-বাজেট আলোচনায় আগামী অর্থবছরের বাজেটে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেয়ার লক্ষ্যে তিনটি বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। প্রথমত, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা চাপের মুখে আছে। এই চাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য মূল্যস্ফীতিকে বাজেটের কেন্দ্রীয় সূচক হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, বর্তমান বৈশ্বিক ও দেশের অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে বাজেটের অগ্রাধিকার আর্থিক সঙ্গতি নির্ধারণ করতে হবে; বিশেষ করে ব্যয়ের ক্ষেত্রে। তৃতীয়ত, লক্ষ্যনির্দিষ্টভাবে পিছিয়ে পড়া ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

এছাড়া আগামী অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নের জন্য তিনটি প্রেক্ষাপট উল্লেখ করা হয়েছিলো। প্রথমত, করোনা অতিমারির পরে আমরা ২০১৯ সালের স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এখনো ফিরে যেতে পারিনি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি ওই পর্যায়ে যেতে আরো তিন বছরের মতো সময় লাগবে বলে প্রতীয়মান হয়। দ্বিতীয়ত, গত ১৪–১৫ বছরের মধ্যে সামষ্টিক অর্থনীতি বর্তমান পরিস্থতির মতো এত চাপে পড়েনি। তৃতীয়ত, সারাবিশ্বে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি। এ তিনটি বিষয়ের সঙ্গে নতুন করে আরেকটি বিষয় যুক্ত হয়েছে, তা হলো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা। বৈশ্বিক পরিস্থিতির মধ্যে দেশে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি, অতিমারির অভিঘাত এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ—এ তিনটি বিষয় এবার দেশের অর্থনীতিতেকে বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি করেছে।

এই বিষয়গুলো মোকাবেলায় বাজেটে কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, তা দেখার বিষয়। অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় ছয়টি চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করেছেন এবং এগুলো যথার্থই বলে মনে হয়েছে। কিন্তু এ চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার জন্য সুচিন্তিত ও কার্যকর পদক্ষেপ বাজেটে নেই। চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে অন্যতম মূল্যস্ফীতি। মূল্যস্ফীতির একটি বড় কারণ হিসেবে বৈশ্বিক পণ্যমূল্য বৃদ্ধিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে খাদ্য, সার ও জ্বালানি—এ তিনটি বিষয় আমদানিতে প্রভাব বিস্তার করে। গত মার্চ পর্যন্ত দেশের মোট আমদানির ৩০ শতাংশই এ তিনটি পণ্যের দখলে। এর মধ্যে জ্বালানি ও খাদ্য আমদানি ব্যয় অব্যাহতভাবে বাড়ছে। ২০২৩ ও ২০২৪ সালেও বিশ্ববাজারে এসব প্রবণতার অনেকগুলোই বজায় থাকবে। তাই উচ্চ আমদানি ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার নিরিখে চাহিদা নিয়ন্ত্রণ ছাড়া অন্য কোনো পদক্ষেপ নেই। আরেকটি সমাধান হলো শুল্কহার কমানো। ভারত সম্প্রতি কেন্দ্রীয়ভাবে শুল্ক সমন্বয়ের মাধ্যমে তেলের দাম কমিয়েছে।

দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ হলো মুদ্রার বিনিময় হার চাপের মুখে আছে। প্রবাসী আয়ে দুই শতাংশ প্রণোদনা দেয়ার মাধ্যমে সরকারের পক্ষ থেকে একটি দ্বৈত বিনিময় হারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু সরকারের নির্ধারিত বিনিময় হার এবং খোলাবাজারের বিনিময় হারের মধ্যে যখন বড় ধরনের পার্থক্য দেখা দেয়, তখন এই দুই বা আড়াই শতাংশ প্রণোদনা কোনো কাজে আসে না। দ্বৈত বিনিময় হার রেখে আগামী দিনে অর্থ-সম্পদের প্রবাহ বাড়ানো বাস্তবসম্মত চিন্তা নয়। সে কারণেই বাংলাদেশ ব্যাংককে তুলনামূলকভাবে একটি ভাসমান বিনিময় হারের দিকে যেতে হয়েছে। ভবিষ্যতে এটিকে একটি বাজারভিত্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত বিনিময় হারের মধ্যে রাখতে হবে। তবে পুরোপুরি বাজারের ওপর ছেড়ে না দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে সময়ে সময়ে অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তার নিরিখে ডলার ছেড়ে বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নিতে হবে।

তৃতীয়ত, সুদের হারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, রেপো (REPO) সুদের হার সামান্য বাড়ানো হয়েছে। অর্থশাস্ত্র বলে, বিনিময় হারে চাপ সৃষ্টি হবে, মূল্যস্ফীতি বাড়বে, কিন্তু সুদের হার ওপরে তোলা হবে না, তা কখনো হয় না। সরকার যদি সংকোচনমূলক পদক্ষেপ নিয়ে বাজার থেকে অর্থ তুলে নিতে চায়, তাহলে সুদের হার বাড়াতে হবে। তবে বর্তমানে সংকোচনমূলক পদক্ষেপ নেয়ার সুযোগ কম, কারণ ব্যক্তিঋণের প্রবৃদ্ধি খুব বেশি না। অন্যদিকে বাণিজ্যনীতি ও শুল্কনীতি ব্যবহার করে মূল্য সমন্বয়ের সুযোগও খুবই সামান্য। এবার বাজেটে বিনিময় হার, শুল্ক হার, সুদের হার, মূল্যস্ফীতির সাধারণ প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ এবং সংকোচনমূলক পদক্ষেপ নেয়ার সুযোগ অনেক কম। এছাড়া বিভিন্ন স্বার্থের প্রাধান্য থাকায় বাজারে উপযুক্ত প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হচ্ছে না। চালের দামের ক্ষেত্রে বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া বাজারের বিভিন্ন বিচ্যুতি রোধ করার জন্য ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)-কে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। যদি বাণিজ্যনীতি ও মুদ্রানীতি সঠিকভাবে ব্যবহার করা না যায়, বিনিময় হার চাপের

মধ্যে থাকে এবং অভ্যন্তরীণ সরবরাহ ব্যবস্থাও আন্তর্জাতিক মূল্য দ্বারা প্রভাবিত থাকে, তাহলে এক্ষেত্রে কৌশলটা কী হওয়া উচিত? কৌশলটা হওয়া উচিত ছিল আর্থিক খাতে সঙ্গতি বাড়ানো এবং সেখানে আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন আনা।

কৃষক আত্মশোষণের মাধ্যমে কৃষি ব্যবস্থাকে সচল রাখছে

আরেকটি বিষয় লক্ষনীয় হালো, যে প্রবৃদ্ধি আমরা অর্জন করেছি তাতে দেখা যাচ্ছে ক্রমান্বয়ে কৃষির ভূমিকা কমে যাচ্ছে। অথচ কৃষিতে কর্মসংস্থান সেভাবে কমছে না। তার অর্থ হলো কৃষিতে উৎপাদনশীলতা খুবই নিচে। কৃষক আত্মশোষণের মাধ্যমে কৃষি ব্যবস্থাকে সচল রাখছে। অথচ এই মুহূর্তে অর্থনীতিতে চাপ কমানো বা চাপ সহ্য করার সক্ষমতা দিতে পারে একমাত্র কৃষিখাত। কিন্তু কৃষিখাতে বাজেটীয় কৌশল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট রূপরেখা নেই। বাজেটে কৃষির যান্ত্রিকীকরণ ও ভর্তুকির কথা থাকলেও সামগ্রিকভাবে কৃষিকে রূপান্তরের জন্য সরকারের যে ঘোষণা রয়েছে, তা বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নেই। এজন্য আগামী দিনে কৃষি খাতে কর্মসংস্থান ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

শ্রম মজুরির অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ৮৫ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। ২০১৯ সালের পরে তাদের মজুরির যে পতন ঘটেছে, তা এখনো আগের জায়গায় ফিরে যায়নি। অথচ মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সমন্বয় করে এটি বাড়ার কথা ছিল।

দুর্বল কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে বাজেট দেয়া হয়েছে

বাজেটীয় কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশে বাজেটীয় কাঠামো সবসময়ই কিছুটা দুর্বল অবস্থার মধ্য দিয়ে তৈরি হয়। কিছু অবাস্তব সংখ্যা দিয়েও তৈরি করা হয়, যা এক ধরনের আর্থিক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে দুই ধরনের বিভ্রান্তি রয়েছে— প্রথমত, বাজেট অর্থনীতির আয়তনের তুলনায় বাড়ে না। দ্বিতীয়ত, বড় বাজেট ব্যাখ্যা দিয়ে যে বাজেট ঘোষণা করা হয়, তার ৮০ শতাংশের বেশি বাস্তবায়ন হয় না। এবারের বাজেটে একটি সংযত উচ্চাশা আছে। অর্থাৎ, বাজেটটি কথায় বড়, কাজে ছোট। ২০২২—২৩ অর্থবছরের বাজেটে বিনিয়োগের যে লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হয়েছে, তা গত বছরের বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম। অর্থাৎ, একটি সংযত পরিস্থিতি। আর গত কয়েক অর্থবছর ধরে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ স্থবির থাকায় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ অর্থনীতিকে চালিয়ে নিয়ে গেছে। আর এবার সরকারি বিনিয়োগের যে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে, তা গত বছরের তুলনায় জিডিপির অনুপাতে এক শতাংশ কম। এতে প্রমাণিত হয়, সরকারের অর্থ ব্যয়ের সক্ষমতা নেই। বিনিয়োগের এই অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও সরকার প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রায় কোনো পরিবর্তন আনেনি। গতবারের তুলনায় কম বিনিয়োগ দিয়ে তার চেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে বোঝা যায়, অর্থনীতির সূচকগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য যথেষ্ট যত্ন নেয়া হয়নি। এছাড়া বাজেটে মধ্যমেয়াদি যে কাঠামো দেয়া হয়েছে, তাতে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। প্রবাসী আয়ের ক্ষেত্রেও বিষয়টির ত্রুটিগুলো বিবেচনা করা হয়নি। অর্থাৎ, মধ্যমেয়াদি কাঠামোর সঙ্গে বাজেটের কোনো সামঞ্জস্য নেই। এমন পরিস্থিতিতে আর্থিক খাতের সঙ্গতি ব্যতিরেকে বাজেট বাস্তবায়নে এগিয়ে যাওয়া যাবে না।

ঘাটতি মোকাবেলার কর্মকৌশল যথোপযুক্ত নয়

এবার গত বছরের তুলনায় বাজেট ঘাটতি বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু বাজেট ঘাটতি মেটানোর পদ্ধতিটা কতখানি কার্যকর, তা বিবেচনা করতে হবে। এ ঘাটতির অর্ধেকের বেশি বৈদেশিক উৎস থেকে পূরণের লক্ষ্য নেয়া হয়েছে, এর মধ্যে বেশিরভাগই দীর্ঘমেয়াদি ঋণ। কিন্তু এ ঋণ আসে মূলত প্রকল্প সাহায্য হিসেবে। তাই বাজেট সহায়তা হিসেবে ব্যবহার-উপযোগী অর্থের জোগান বাড়ানোর জন্য সরকার বিশ্বব্যাংক ও এডিবির কাছে আবেদন করেছে। আর এরই মধ্যে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে ৫০ কোটি (৫০০ মিলিয়ন) ডলারের বাজেট সহায়তার জন্য চুক্তি হয়েছে। সেই চুক্তির শর্ত হিসেবে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে উৎসে কর বাড়ানোর ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে যে ঋণ নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে, তার বেশিরভাগই আসবে ব্যাংক খাত থেকে। যে কারণে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের বিষয়ে এক ধরনের সংযত অবস্থান লক্ষ করা যাচ্ছে। সুতরাং এটা সহজেই বলা যায়, যে কাঠামোর ওপর ভর করে বাজেট দেয়া হয়েছে, সেটি অনেকাংশে দুর্বল। আর যদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো দুর্বল হয়, তাহলে তার ফলে সেই জনগোষ্ঠীই সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয় যাদের আয় বাজারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাড়ে না। এই মানুষগুলো মূলত সীমিত ও নিম্নআয়ের মানুষ। কাজেই আগামী অর্থবছরে কোন শ্রেণির মানুষকে সুরক্ষা দিতে হবে, সে বিষয়ে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

পরোক্ষ করনির্ভর রাজস্ব কাঠামো

বাজেটে কর কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বেশিরভাগই আসবে পরোক্ষ কর থেকে। আর প্রত্যক্ষ কর থেকে আসবে সেই করের মাত্র ৩২ শতাংশের মতো; এর বিপরীতে পরোক্ষ কর ৪৬ শতাংশ। আর এই মুহূর্তে যে কর কাঠামো প্রস্তাব করা হয়েছে, তা বিত্তশালীদের বিরুদ্ধে নয়, বরং পরোক্ষ করের কারণে বোঝাটি সীমিত আয়ের মানুষের ওপরই পড়বে। অন্যদিকে কর্পোরেট কর হারে সব ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া হলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য করমুক্ত আয়সীমা বাড়ানো হয়নি। কাজেই বাজেট প্রস্তাবসমূহ কোন্ শ্রেণিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে, সে বিভাজনটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

ভর্তুকি ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা

নাগরিক প্ল্যাটফর্মের প্রাক-বাজেট আলোচনায় মেগা প্রকল্পগুলোর বরাদ্দ কিছুটা কমিয়ে তা ভর্তুকি হিসেবে ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। গত বছর ১০টি মেগা প্রকল্পে মোট এডিপির ২৪ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। এবারও সেখানে বরাদ্দ প্রায় একই। একমাত্র রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রই মোট এডিপি বরাদ্দের ৯ শতাংশ নিয়ে যাবে। অথচ তাৎক্ষণিকভাবে এগুলোর সুবিধা জনগণ পাবে না। এর সুবিধা পেতে সময় লাগবে। এ কারণেই ভর্তুকির ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রে সরকার চেষ্টা করেছে এবং প্রায় ৫৪ শতাংশ ভর্তুকি বাড়িয়েছে। কিন্তু এই ভর্তুকির মধ্যে এখনো প্রাধান্য বিস্তার করে আছে পিডিবি। আর সেই ভর্তুকির অর্থে অলস বসে থাকা আইপিপি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর ক্যাপাসিটি চার্জ পরিশোধ করা হচ্ছে।

আমরা ভর্তুকি বাড়াতে বলছি। বৈশ্বিক পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে আগামীতে এর প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাবে বলে আমরা মনে করছি। তবে ভালো ও খারাপ দুই ধরনের ভর্তুকি আছে। ভালো ভর্তুকি বাড়াতে হবে। অলস বসে থাকা বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য প্রদেয় খারাপ ভর্তুকি প্রত্যাহারের উদ্যোগ নিতে হবে। এ কারণে ভর্তুকির কাঠামোগত সংস্কার এনে এখানে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

সামাজিক সুরক্ষার গুরুত্ব কমেছে

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে দেখা যাচ্ছে, বাজেটের মোট রাজস্ব ব্যয়ের অংশ হিসেবে গতবারের তুলনায় এবার এ খাতে বরাদ্দ কমে গেছে। আগেরবার এটি বাজেটের ১৭ শতাংশ ছিল, এবার তা হ্রাস পেয়ে ১৬ দশমিক ৭৫ শতাংশ হয়েছে। আর মোট জিডিপির অংশ হিসেবে এটি গতবারের তুলনায় নিচে নেমে গেছে। গতবছর ছিল জিডিপির ২.৭ শতাংশ, এবার তা ২.৫৫ শতাংশ। যেমন, সামাজিক সুরক্ষার ভেতরে আরও অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যেগুলো নীতিগতভাবে সামাজিক সুরক্ষার মধ্যে থাকা উচিত নয় বলে আমরা মনে করি। এর মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের পেনশন অন্তর্ভুক্ত। এই পেনশন বের করে দিলে বাস্তবে এটি চলে আসবে ১.৯২ শতাংশে। বাস্তবিক পক্ষে লক্ষ্যনির্দিষ্ট খাতে তিন হাজার কোটি টাকা কম বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, ভর্তুকি বাড়ানো হলেও পিছিয়ে পড়া মানুষ প্রত্যক্ষভাবে তার সুবিধা পেল না। এছাড়া সর্বজনীন পেনশন স্কিমের ঘোষণা থাকলেও তার জন্য কোনো অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়নি। তাছাড়া এ পেনশন স্কিম চালু করার জন্য একটি আইনও প্রয়োজন হবে।

৫০০ টাকা করে যে ভাতা দেয়া হয়, তা দিয়ে একজন দুস্থ মানুষ বা একটি পরিবারের কতটুকু কাজে লাগে? এক্ষেত্রে সবাইকে কমপক্ষে এক হাজার টাকা করে দেওয়ার বিষয়ে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছিল। এছাড়া এক হাজার টাকা করে যুব ভাতা চালু করার কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু সে সেগুলো কোনোটিই হয়নি।

স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে দেখা যাচ্ছে বরাদ্দ গতবারের তুলনায় শূন্য দশমিক এক শতাংশও বাড়েনি। শিক্ষাখাতে জিডিপির ১.৮৩ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, গত বছর যা ছিল ১.৮১ শতাংশ। স্বাস্থ্য খাতে এবার ঘোষণা করা হয়েছে জিডিপির ০.৮৩ শতাংশ, যা গতবার ছিল ০.৮২ শতাংশ। এখানে লক্ষণীয় যে, সরকারের আয়ের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন হলেও ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের পরিবর্তন আনা হয়নি।

মধ্যবিত্ত শ্রেণি রাজনৈতিকভাবে প্রতিনিধিত্বহীন

বাজেট প্রণয়নে সরকার মধ্যবিত্তের প্রতি একেবারেই অমনোযোগী ছিল। মধ্যবিত্তরা এই মুহূর্তে এক ধরনের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বহীন এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে অভিভাবকহীন। গত এক দশকে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠেছে, তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক ধরনের অবহেলা লক্ষ করা যাচ্ছে। উপরন্তু অর্থমন্ত্রী মধ্যবিত্তদের কর ফাঁকির অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। বাজেটে মধ্যবিত্তদের মেধা-মনন কাজে লাগানোর বিষয়ে মনোযোগ না দিয়ে বরং তাদের ব্যবহার্য নানা উপকরণ, যেমন ল্যাপটপ, স্মার্টফোন, ওয়াটার পিউরিফায়ার, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদির ওপর শুল্ক ও অন্যান্য কর বাড়ানো হয়েছে।

বাজেটে শিশু, ট্রান্সজেন্ডার, শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ও দুর্গম এলাকায় বসবাসকারীদের বিষয়ে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এগুলো সমর্থনযোগ্য এবং তা যাতে ঠিকমতো বাস্তবায়ন করা হয় সে বিষয়ে নজর দিতে হবে।

অর্থমন্ত্রীর ছয় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কার্যকর পদক্ষেপের ঘোষণা নেই বাজেটে অর্থমন্ত্রী যে ছয়টি চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলো সঠিকভাবেই নিরূপিত হয়েছে বলে মনে করা যায়। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চ্যালেঞ্জের স্বীকৃতি থাকলেও তা কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে সে বিষয়ে কোনো রূপরেখা দেওয়া হয়নি। সারের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি কিছু ক্ষেত্রে ভর্তুকি বাড়ানোর ঘোষণা থাকলেও তার ভিত্তিতে গ্যাস-বিদ্যুতের দাম না বাড়ানোর নিশ্চয়তা বাজেটে দেওয়া হয়নি। বরং বিদ্যুতের দাম বাড়বে বলে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা রয়েছে। তৃতীয়ত, প্রাধিকারভুক্ত প্রকল্পের কাজ শেষ করার জন্য বৈদেশিক সহায়তা বিশেষভাবে ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সেই প্রাধিকারভুক্ত প্রকল্পের তালিকা বাজেটে দেওয়া হয়নি। এরপরে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে সময়মতো প্রকল্প শেষ করার বিষয়ে বলা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্পগুলো সময়মতো শেষ করার জন্য কী ধরনের আর্থিক ও সামাজিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো বর্ণনা নেই। এরপর নতুন করদাতা সংগ্রহ ও ভ্যাট আহরণ বাড়ানোর বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজনীয় ইএফডি মেশিন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোয় স্থাপন এখনো নিশ্চিত হয়নি। উপরন্তু পুরোনো করদাতাদের হয়রানির আশঙ্কা বেড়েছে। সবশেষে বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা রক্ষার কথা বলা হয়েছে। এখানে শ্রীলঙ্কার একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যখন শ্রীলঙ্কার বিনিময় হারের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়েছিল, তখন তারা আইএমএফের কাছে ব্যালেন্স অব পেমেন্ট সহায়তা চাওয়ার ক্ষেত্রে দেরি করেছিল। তখন যদি তারা অন্তত এক বিলিয়ন ডলার আইএমএফ থেকে নিয়ে রিজার্ভের মজুত শক্তিশালী করত, তাহলে বর্তমান দুর্যোগ কাটানো তাদের জন্য অনেকটা সহজ হতো। এক্ষেত্রে আমাদেরও আগে থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে বাজেটীয় সহায়তা পাওয়ার পাশাপাশি আইএমএফ থেকেও সহায়তা নেয়ার প্রয়োজন আছে কিনা, তা চিন্তা করে দেখা উচিত।

এই বাজেট তৈরি হয়েছে একটি সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে এবং আগামীতে এই অনিশ্চয়তা আরও বাড়বে। আগেই বলা হয়েছে, এর সঙ্গে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এক্ষেত্রে নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে দক্ষতা ও তার দ্রুত

বাস্তবায়নের পাশাপাশি সামাজিক সমর্থন জোরদার করতে হবে। সেটা করার সময় আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে, যেন মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে থাকে। এছাড়া সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অংশ যাতে আরো বৃদ্ধি পায় সেই চেষ্টা নিতে হবে।

এ বাজেটে শ্রমিক শ্রেণি ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে না

বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার বলেন, এই বাজেট পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য কিনা, তা বিচার করতে হলে কয়েকটি মানদণ্ড বিবেচনায় নিতে হবে। তা হলো যে শ্রমিক শ্রেণির ওপর নির্ভর করে অর্থনীতি বড় হচ্ছে, তাদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ বাজেটে আছে কিনা বা একটি জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কাঠামো আছে কিনা, তা বিচার্য বিষয়। শ্রমিক, মজুর ও কৃষক শ্রেণি বাজারে গিয়ে খাদ্য ক্রয় বা চিকিৎসাসেবা নিতে পারছে কিনা, তা দেখার বিষয় রয়েছে। এছাড়া তাদের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা বিধান এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা কোনো সংকটময় মুহূর্তে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে এসব মানুষকে সহায়তা দেওয়ার জন্য বাজেটে পদক্ষেপ আছে কিনা, তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। বর্তমানে দেশে শ্রমশক্তির সংখ্যা সাত কোটি। তাদের ক্রয়ক্ষমতার সঙ্গে বর্তমান বাজার পরিস্থিতির কোনো সঙ্গতি নেই। তাদের ক্রয়ক্ষমতা কীভাবে বাড়ানো যাবে, সে বিষয়ে বাজেটে কোনো দিক নির্দেশনা নেই। অতিমারিকালে বেশিরভাগ শ্রমিকের বেতন কমে যায়, তৈরি পোশাকশিল্পের অনেক অর্ডার বাতিল হয় এবং অনেকে কর্মহীন হয়ে পড়ে। এ সময় উদ্যোক্তাদের সরকারি সুবিধা দেয়া হয়, কিন্তু শ্রমিকদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। মালিকপক্ষ উন্নতির ভাগীদার হয়, কিন্তু ক্ষতির ভাগীদার হয় শ্রমিক। এর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে জবাবদিহি বাড়াতে হবে। তিনি আরও বলেন, বাজেটে যে তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ করা হয়, সেগুলোর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার কোনো ব্যবস্থা নেই। সরকারের তথ্যগুলো কতটা নির্ভরযোগ্য, তা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। বাজেট ট্রান্সপারেন্সি ইনডেক্স নামে একটি আন্তর্জাতিক সূচক আছে। এ সূচকে বাংলাদেশের স্কোর শতকরা ৩০, যা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বনিম্ন।

স্বতন্ত্র শিশু অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা সময়ের দাবি

আলোচনায় অংশ নিয়ে সেভ দ্য চিলড্রেনের পরিচালক রিফাত বিন সাত্তার বলেন, বাজেটে শিশুদের জন্য বরাদ্দের বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা নেই। কাজেই শিশুদের ওপর বাজেটের সরাসরি প্রভাব বিশ্লেষণ করা খুব কঠিন। শিশুদের বাদ দিয়ে বাজেট প্রণয়ন করা হলে সে বাজেট অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বাজেটে শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বা শিশু সুরক্ষার জন্য কোনো বরাদ্দ দেখা যাচ্ছে না। মূলত মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় শিশুদের নিয়ে কাজ করে। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থাকলেও শিশুবিষয়ক কোনো অধিদপ্তর নেই। সরকার বিভিন্ন সময় এমন অধিদপ্তর করার কথা বলে থাকলেও বর্তমান বাজেটে সে বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই। বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া খুবই কেন্দ্রীভূত। ফলে এটি স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক হয় না। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় জনগণ বাজেট প্রণয়নে মতামত দিতে পারেন না। এছাড়া শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের বড় বড় প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি খুবই শ্লথ, যা অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করা হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে সর্ববৃহৎ প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পিইডিপি-৪ ও অন্যান্য শিশুকেন্দ্রিক প্রকল্প ও কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নে জোর দিতে হবে। পাশাপাশি পুষ্টিহীনতা ও বাল্যবিয়ে রোধে উদ্যোগ নিতে হবে। তা না হলে ভবিষ্যতের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা কঠিন হবে। উল্লেখযোগ্য, এসডিজির দু'টি মূলমন্ত্র আছে। একটি হচ্ছে 'কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না', আরেকটি হচ্ছে 'সমগ্র সমাজ অন্তর্ভুক্তির নীতি' (হোল অব সোসাইটি অ্যাপ্রোচ), অর্থাৎ সরকারের পাশাপাশি নাগরিক সমাজ ও ব্যক্তি খাতসহ সবার অংশগ্রহণে এটি বাস্তবায়ন করতে হবে। আর সবাই মিলে কাজ করার সবচেয়ে বড় প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে বাজেট। সেখানে যদি সবাই একত্রে কাজ করতে পারি, তাহলে একটি শিশুবান্ধব সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠান থাকা উচিত

অভিযানের নির্বাহী পরিচালক বনানী বিশ্বাস বলেন, সরকার নিম্নআয়ের মানুষের জন্য গৃহনির্মাণসহ আরও অনেক উন্নয়ন প্রকল্প নিয়েছে। কিন্তু এসব প্রকল্পের সুফল দলিতরা ভোগ করতে পারেন না। দলিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কথা সুনির্দিষ্টভাবে বাজেটে উল্লেখ করা হয় না। এছাড়া সিটি কর্পোরেশনে পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগে দলিত জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট কোটা থাকলেও তা অনুসরণ করা হয় না। প্রভাব খাটিয়ে মূল স্রোতধারার জনগোষ্ঠী এ চাকরিগুলো দখল করে নিচ্ছে। আর চাকরি পাওয়ার পর তারা নিজেরা কাজ না করে প্রথাগত দলিতদের মাধ্যমেই সে কাজগুলো করিয়ে নেয়। ফলে সিটি কর্পোরেশন থেকে যে ফ্ল্যাট বরাদ্দ দেয়া হয়, তা দলিতরা পাচ্ছেন না। কারণ অন্যের পক্ষে সাব-কন্ট্রাক্টে কাজ করলেও পরিচ্ছন্নতা কর্মীর সিটি কর্পোরেশনের নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মী নন। ফলে সে যার পক্ষে কাজ করছে, ফ্ল্যাটের সুবিধাটা সেই চাকরিওয়ালা ব্যক্তিটিই ভোগ করছেন।

বাংলাদেশে এক কোটির মতো দলিত জনগোষ্ঠী আছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, দলিতদের সুবিধার্থে সরকারের উচিত একটি আলাদা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। তিনি আরও দাবি করেন, এখন থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত প্রতিটি অর্থবছরের বাজেট এসডিজিকেন্দ্রিক হতে হবে এবং দলিতদের প্রতি বাজেটে সংবেদনশীল হওয়ার সদিচ্ছা সরকারের থাকতে হবে।

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে বাজেটে উদ্যোগ নেই

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের পরিচালক (গার্লস রাইটস) কাশফিয়া ফিরোজ বলেন, এবারের বাজেটে দুই লাখ ২৯ হাজার ৪৮৪ কোটি টাকার জেন্ডার বাজেট পেশ করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, এ বাজেট গতবারের তুলনায় ৩০ হাজার ৮৯৭ কোটি টাকা বেশি। বাজেটে নারীর উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থানের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে বলে অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। এগুলো ভালো উদ্যোগ। কিন্তু নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়ে বাজেটে কিছুই বলা হয়নি। অথচ এই সহিংসতার কারণে আমরা প্রতিনিয়ত বিব্রতবোধ করি। এই সহিংসতার অস্তিত্ব পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র সর্বত্র বিরাজমান।

তিনি উল্লেখ করেন, অতিমারিকালে সহিংসতা অনেক বেড়েছে, অথচ সামাজিক সুরক্ষা বাজেটে সহিংসতা প্রতিরোধে কোনো বরাদ্দ নেই। এ সময় মেয়েশিশুরা যারা স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে এবং বাল্যবিয়ের শিকার হয়েছে, তাদের স্কুলে ফিরিয়ে আনার কোনো কার্যক্রম সম্পর্কে বাজেটে উল্লেখ নেই। তাছাড়া অতিমারিকালে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু বাজেটে সেসব বিষয় উঠে আসেনি। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, করোনাকালে পারিবারিক সহিংসতা অনেক বেশি বেড়েছে; যৌন হয়রানিও বেড়েছে। কিন্তু এগুলো প্রতিরোধে বাজেটে কোনো নির্দেশনা পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি আইন ও সালিশ কেন্দ্রের এক পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে ৪৫৪টি। এর মধ্যে ছয় বছরের নিচের শিশু আছে ৫৬ জন। এই পাঁচ মাসে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৪০১টি। এছাড়া ধর্ষণের চেষ্টা, ধর্ষণের পর আত্মহত্যা এবং ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু বাজেটে এমন সহিংসতা থেকে নারী ও শিশুদের রক্ষার জন্য কোনো পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করা হয়নি। সবশেষে শিশু সুরক্ষার কথা যদি বলা হয়, গত তিন বছর ধরে সরকার শিশু বাজেট বিষয়ে কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ করছে না। সে কারণে শিশুদের সুরক্ষা ও তাদের উন্নয়নে প্রকৃতপক্ষে বাজেটের কত শতাংশ অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে, তা নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য আগামীতে এসব বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে।

এ বক্তব্যের সূত্র ধরে ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশ বেশ কয়েক বছর ধরেই জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন করছে। এটি বৈশ্বিক পরিস্থিতির বিচারে একটি প্রশংসনীয় কাজ। বাজেট ট্রান্সপারেন্সি ইনডেক্স অনুযায়ী, ২০২১ সালে ১২০টি দেশের মধ্যে মাত্র ১০টি দেশ জেন্ডার বাজেট দিয়ে থাকে। বাংলাদেশ তার মধ্যে একটি। এটি

ইতিবাচক। এছাড়া বাংলাদেশ জেন্ডার সমতা সূচকেও এগিয়ে আছে। কিন্তু নারীর প্রতি সহিংসতাসহ সার্বিক বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে যদি বাজেট প্রণীত না হয়, তাহলে সামগ্রিক অগ্রগতি বিঘ্নিত হবে।

পাচার করা অর্থ ফেরত আনার সুযোগ বেআইনি ও অসাংবিধানিক

ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, বর্তমানে সংসদ সদস্যদের ৬২ শতাংশই ব্যবসায়ী। কাজেই বাজেট ব্যবসাবান্ধব ও প্রশাসনবান্ধব হবে, এটিই স্বাভাবিক। বাজেটের একটি বড় অংশ প্রশাসনিক ব্যয়ে চলে যাচ্ছে এবং এটি ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী বা শ্রমিক শ্রেণিবান্ধব বাজেট হওয়ার বিষয়টি স্বপ্ন হিসেবে আছে, বাস্তবে নেই। যদিও আমাদের প্রত্যাশা ছিল এবারের বাজেটে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং আমরা একটি জনবান্ধব বাজেট পাব, কিন্তু এই বাজেট হয়েছে দুর্নীতি ও অনৈতিকতাকে প্রশ্রয় ও বৈধতা দেয়ার বাজেট, একটি সংবিধানবিরোধী বাজেট। যারা অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন তা করে অবৈধভাবে বিদেশে পাচার করেছে, এ বাজেট তাদের সুরক্ষা দিয়েছে। বিষয়টি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী অপরাধ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে ২০১২ সালের অর্থপাচার প্রতিরোধ যে আইন আছে, তাতে বলা হয়েছে পাচারকৃত অর্থ জব্দ করা হবে। আর যে পরিমাণ অর্থ জব্দ করা হবে, তার দ্বিগুণ জরিমানা হবে এবং ৪ থেকে ১২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হবে। বাজেট বক্তৃতায় এ আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে অর্থপাচারকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া তাদের করের ক্ষেত্রেও বৈষম্যমূলক সুবিধা দেওয়া হয়েছে। যেখানে দেশের অভ্যন্তরে সৎ করদাতারা ২৫ থেকে ৩২ শতাংশ কর দিচ্ছেন, সেখানে এই পাচারকারীরা মাত্র সাত শতাংশ কর দিয়ে তাদের পাচার করা অর্থ বৈধ করে নেয়ার সুযোগ পাবেন। এটি সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কারণ সংবিধানে পরিষ্কারভাবে বলা আছে, সব নাগরিক সমান অধিকার ভোগ করবে এবং আইনের চোখে সবাই সমান হবে। এর মাধ্যমে আমরা বৈষম্য ও অনৈতিকতাকে বৈধতা দিচ্ছি, দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছি, অর্থপাচারকে সুরক্ষা ও লাইসেন্স দিচ্ছি। ড. ইফতেখার প্রশ্ন অরেন, সরকার কি এর মাধ্যমে ২০১২ সালের অর্থপাচার প্রতিরোধ আইন বাতিল করল? এ আইনের সুবাদে বাংলাদেশ এগমন্ট (Egmont Group) গ্রুপের সদস্য। এ বিষয়ে আমরা এগমন্ট গ্রুপকে কী জবাব দেব, সেটা কি জানি? সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অবাস্তব এ প্রস্তাবের মাধ্যমে একদিকে জাতীয়ভাবে সরকার আমাদের একটি অবমাননাকর জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে বলে আশঙ্কা করা যায়। আর যারা পাচার করেছে, তারা এই সাত শতাংশ কর দিয়ে যে তাদের সম্পদ বৈধ করবে, এটি একটি দিবাস্বপ্নের মতো। এর আগেও দেশে জাতীয়ভাবে কালো টাকা সাদা করার যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তার ফলাফল কী হয়েছে, তা সবার জানা আছে। খুব সামান্য পরিমাণ অর্থই সেই প্রক্রিয়ায় বৈধ হয়েছে। আর বিদেশ থেকে অর্থ ফেরত আনা অত্যন্ত জটিল কাজ। এখন যদি পি কে হালদারের কথাই ধরি, তাহলে তিনি চাইলেও কিন্তু তার পাচার করা অর্থ ফেরত আনতে পারবেন না। কারণ বিষয়টি তার একার হাতে নেই। এটি নির্ভর করছে ভারত সরকার আমাদের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তিতে যাবে কিনা, তার ওপর। বিদেশে চাকরি বা ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত বৈধ অর্থ আনার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু পাচার করা অর্থ আনতে হলে সংশ্লিষ্ট দেশের সঙ্গে চুক্তি করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

তিনি বলেন, বাজেটে পিছিয়ে পড়া ও নিম্নআয়ের মানুষের প্রতি যে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, তা হয়নি। সামাজিক সুরক্ষা খাতে যে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, সেখানে সামাজিক সুরক্ষা বলতে যা বোঝায় কেবল সেগুলোই নয়, এর বাইরের অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত আছে। এসবের মধ্যে রয়েছে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের পেনশন, সঞ্চয়পত্রের সুদ, করোনাকালে বিতরণ করা প্রণোদনা ঋণের সুদ মওকুফের অংশ প্রভৃতি। কাজেই বাস্তবে সামাজিক সুরক্ষা খাতে কত ব্যয় হবে, সে বিষয়ে স্বচ্ছতার ঘাটতি আছে।

বাজেটের কিছু ইতিবাচক দিক আছে বলে ড. ইফতেখার মনে করেন, যেমন জেন্ডার বাজেট। কিন্তু বাজেটের স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। এক্ষেত্রে আমরা দক্ষিণ এশিয়ার সবার নিচে অবস্থান করছি। এ বিষয়ে আমাদের ভাবতে হবে। বাজেট স্বচ্ছতার সঙ্গে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য যেসব আন্তর্জাতিক পদ্ধতি আছে,

সেগুলো কখনো সরকার অনুসরণ করে না। বাজেট বাস্তবায়নের বিষয়টি সার্বিক অডিটের আওতায় আনার চর্চা আমাদের দেশে নেই। পৃথিবীর মাত্র ১৯টি দেশে এই চর্চাটা অনুপস্থিত। বাংলাদেশ সেই দেশগুলোর একটি। আমরা যদি সত্যিকার অর্থে একটি জনবান্ধব বাজেট চাই, তাহলে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বাজেটীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (ফিসক্যাল ইন্সটিটিউশন) দরকার আছে। এর আগে বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে কিছু আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার চর্চা ছিল। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে এ চর্চাটি রয়েছে। যে প্রতিষ্ঠান কোনো ধরনের স্বার্থের দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে থেকে দল নিরপেক্ষভাবে বাজেট বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবে। বর্তমানে এ প্রক্রিয়াটি দুর্বল হয়ে পড়ছে।

এ প্রসঙ্গে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বিদেশে অর্থ-সম্পদ বৈধ করার বিষয়ে যে সুযোগ দেয়া হয়েছে, তা সম্পূর্ণ অনৈতিক, রাজনৈতিকভাবে হঠকারী এবং অর্থনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ অনুপোযোগী পদক্ষেপ। এ পদক্ষেপ এমন একটি সময়ে নেয়া হয়েছে, যখন আগামী বছর আমরা জাতীয় নির্বাচনের দিকে যাব। তাছাড়া এটি এমন একটি সময় যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বেনামি সম্পদের অনুসন্ধান করা হচ্ছে এবং দেশের বাইরে বেনামি সম্পদের কারণে একজন বাংলাদেশিকে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে আমরা সৎ করদাতারা ২৫ থেকে ৩২ শতাংশ কর দিয়ে আসছি। এক্ষেত্রে একদিকে দেশে চুরির সুযোগ দেওয়া হলো, অন্যদিকে সেই টাকা অবৈধভাবে বিদেশে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হলো। এই দ্বৈত চুরির টাকা সৎ করদাতাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ বৈষম্যমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে মাত্র সাত শতাংশ কর দিয়ে বৈধতা দেওয়ার উদ্যোগ হলো। এটা কখনো কার্যকর হবে না, অথচ সরকারের বদনাম হলো। বাজেটে দরিদ্র মানুষের পক্ষে পদক্ষেপ বাড়ল না, অথচ কোনো কারিগরি মূল্যায়ন এবং সরকারের নীতি- নির্ধারণী কোনো ফোরামে আলোচনা ব্যতিরেকেই এমন একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত কার স্বার্থে নেয়া হয়েছে, তা বোধগম্য নয়।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, এই মুহূর্তে জাতীয় ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জ্বালানি খাতের ব্যবস্থাপনাটা দুর্বল হয়ে গেছে। জ্বালানি খাত দারিদ্র্য বিমোচন ও বিনিয়োগসহ সবকিছুর সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এ নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা হচ্ছে। আলোচনা শুধু উৎপাদন খরচ ও ভর্তুকির মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এর সঙ্গে জনকল্যাণের সমীকরণটা দেখানো হচ্ছে না। তিনি বলেন, মধ্যবিত্ত এখন ত্রিমুখী আক্রমণের শিকার। প্রথমত, বৈষম্যমূলক অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি; দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি; তৃতীয়ত, বর্তমান প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এ থেকে সুরক্ষার কোনো উদ্যোগ বাজেটে নেই। বলা যায়, এই বাজেট ছিনতাই হয়ে গেছে।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

সভাপতি

ড. ইফতেখারুজ্জামান
কোর গ্রুপ সদস্য, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম
এবং
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

প্রারম্ভিক বক্তব্য

আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ
সমন্বয়ক
নাগরিক প্ল্যাটফর্ম

মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
আহ্বায়ক, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম এবং
সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

আলোচকবৃন্দ

মিজ তাসলিমা আখতার
সভাপ্রধান
বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি

মিজ কাশফিয়া ফিরোজ
পরিচালক (গার্লস রাইটস)
প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

জনাব রিফাত বিন সাত্তার
পরিচালক - প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কোয়ালিটি
সেভ দ্য চিলড্রেন, বাংলাদেশ

মিজ বনানী বিশ্বাস
নির্বাহী পরিচালক
অভিযান

ব্রিফিং নোট প্রস্তুত করেছেন: শাহরিয়ার আলম অপূর্ব এবং অন্বেষা জাফরিন

সিরিজ সম্পাদনায়: অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

আয়োজক

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

www.bdplatform4sdgs.net | BDPlatform4SDGs | Citizen'sPlatformforSDGsBangladesh | bdplatform4sdgs

ফেব্রুয়ারি ২০২৩

সচিবালয়: সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা
ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৪৮১১৮০৯০ । ওয়েব: www.bdplatform4sdgs.net । ই-মেইল: coordinator@bdplatform4sdgs.net